ISSN 2230 9381

বলাকা

সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

বাঙালির লোকসাহিত্য

ISSN 2230-9381

বলাকা

সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা
নির্বাচিত পাঠকের কাগজ

বর্ষ-২৭ সংখ্যা-৩৬ ফেব্রুয়ারি-২০১৮

উপদেষ্টামণ্ডলী
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য স্বপন বসু সাধন চট্টোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদকমণ্ডলী
পিয়ালি দে মৈত্র সারদা মাহাতো সুস্মিতা সাহা

সম্পাদক
ধনঞ্জয় ঘোষাল

সম্পাদকীয় দপ্তর
৯, নিমচাঁদ কাঁড়ার স্ট্রিট, আড়িয়াদহ, কলকাতা-৭০০০৫৭
প্রকাশ দপ্তর
শিউলি ঘোষাল, বারাসাত রোড, পো: সোদপুর, কলকাতা-৭০০১১০
(পানিহাটি কলেজের নিকটে)
মো : +৯১-৯২৩১৬২৫৭৪২, ৯৮০৪২৩৯১১৮
e-mail : dhananjayghosal@rediffmail.com

বর্ণসংস্থাপন ও মুদ্রণ
তনুশ্রী প্রিন্টার্স, ২১বি, রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : সুব্রত মাজী

দাম : ১৭৫ টাকা

ISSN 2230-9381

বলাকা

সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা
নির্বাচিত পাঠকের কাগজ
বাঙালির লোকসাহিত্য
বর্ষ-২৭ সংখ্যা-৩৬ ফেব্রুয়ারি-২০১৮

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৫

পর্ব - এক

লোকসংস্কৃতির চর্চা করব কেন? ঃ বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী ৮
বাংলা লোকসাহিত্যচর্চা : একটি মূল্যায়ন ঃ সৌমেন দাশ ১৫
লোকসাহিত্য : প্রাসঙ্গিক ভাবনা ঃ ধনঞ্জয় ঘোষাল ২৪
লোকভাষা কি এবং কেন ঃ নারায়ণ হালদার ৩০
ধ্বন্যাত্মক শব্দে বাংলার লোকজীবন ঃ আশিস খাস্তগীর ৩৫
লোকসাহিত্যে নৃতাত্ত্বিক উপাদান : অনুসন্ধানের উপক্রমণিকা ঃ সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০
উনিশ শতকে বাংলার লোকসংস্কৃতি গবেষণায় প্রবাদের অন্বেষণ : একটি সমীক্ষা ঃ রমেনকুমার সর ৪৭

পর্ব - দুই

বাংলা মঙ্গলকাব্যে লোক-উপাদানের ব্যবহার ঃ সনৎকুমার নস্কর ৫৪
বাংলার ব্রতকথা : অজস্র তথ্য, কয়েকটি সত্য ঃ পিয়ালি দে মৈত্র ৭১
বনবিবি : লোকসাহিত্যে সম্প্রীতির ঐক্য ঃ সারদা মাহাতো ৮১
লোক, লোকোত্তর : মহাভারত ঃ নিবেদিতা বিশ্বাস ৮৯
লোকাচার ঃ তপন বর ৯৩
বাংলা প্রবাদ-প্রবচন: ধারণা ও গঠন-বিচার ঃ সুজয়কুমার মণ্ডল ১০০
কিংবদন্তি-ঘটনা ও লোকবিশ্বাসের মেলবন্ধন ঃ সুমন চ্যাটার্জ্জী ১০৯
লোকনাট্য : একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগকলা ঃ অনির্বাণ মান্না ১১৫
পরম্পরায় বাংলা লোকনাট্য ঃ অপূর্ব দে ১২৬
বাংলার লৌকিক ছড়া ঃ কোয়েল চক্রবর্তী ১৩৪
ধাঁধা ভাষান্তরে ঃ বাঁশরী মুখোপাধ্যায় ১৪১
নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে লোকজ উপাদান ঃ আফরোজা খাতুন ১৪৫

লোকনাট্য : একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগকলা

অনির্বাণ মান্না

শিষ্টসাহিত্যের সমান্তরালে যেমন লোকসাহিত্য, শিল্পকলার- লোকশিল্প, নৃত্যের- লোকনৃত্য, তেমনই নাটকের সমান্তরালে আছে লোকনাট্য। প্রথমটি শিষ্টসমাজের ব্যক্তির লিখিত সৃষ্টি। পরিশীলিত নাটকের উপস্থাপনায় কুশীলবের পরিশীলিত অনুশীলন, নির্দিষ্ট মঞ্চ ও তার সজ্জা, চরিত্রের মানানসই পোশাক, বৈদ্যুতিক আলোর মনোমুগ্ধকর ব্যবহার, আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো সাউণ্ডসিস্টেম ও সেই অনুসারী আবহসঙ্গীত, সর্বোপরি শিক্ষিত দর্শক তার রসভোক্তা। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ লোকনাট্য হল গ্রামীণ নিরক্ষর মানুষের যৌথপ্রয়াস। সচেতনতা ও বিনোদন সৃষ্টি পরিশীলিত নাটকের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু লোকনাট্যের উদ্ভবের অন্তরালে লুকিয়ে আছে লোকমানসের যাদু-অনুষ্ঠান, উৎসব-অনুষ্ঠান এবং খেলাধূলার অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক আচার-বিশ্বাস-সংস্কার পরিপূরণের অভিপ্রায়।

লোকনাট্যের কোন লিখিত রূপ থাকে না। তাই নাট্যকারও থাকে না। একটা কাহিনী মাথায় রাখলেও লোকনাট্যের কুশীলব তাৎক্ষণিক ভাবে সংলাপ রচনা করে পালাকে রূপ দেয়। তবে পালাতে ব্যবহৃত গানগুলি শিল্পীরা আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখে। বর্তমানে লোকনাট্যে লিখিত পালা অনুসরণ করা হলেও আদিতে তা ছিল না। লোকনাট্যে কুশীলবের সংখ্যা বেশি থাকে না। একজনকে একাধিক চরিত্রে অভিনয়ও করতে হয়।

এতে কোনও মঞ্চ থাকে না। মাটির ওপরেই আসর বসে। মাঝখানটি অভিনয়ের জন্য ফাঁকা রেখে তার চারদিকে গোল হয়ে দর্শক বসে। লোকনাট্য দিনে অনুষ্ঠিত হলে আলো ব্যবহারের প্রশ্নই আসে না। রাতে হলে হ্যাজাক ব্যবহার করা হত। অবশ্য এখন বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহৃত হচ্ছে।

পরিশীলিত নাটক অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক নয়। লোকনাট্য, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক, দুই- হতে পারে। যেমন, চড়কপূজা উপলক্ষে গম্ভীরা লোকনাট্যটি অনুষ্ঠিত হয়। কোনও অনুষ্ঠান ছাড়াই আলকাপ বছরের যে-কোনও সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে। তাই আলকাপ অনানুষ্ঠানিক লোকনাট্য। লোকনাট্যে নারীর চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করে থাকে। এদের ছোকরা বা ছুকরি বলা হয়। বর্তমানে নারীই নারীর চরিত্রে অভিনয় করে থাকে। লোকনাট্যে পরিশীলিত নাটকের মতো মেকআপ ম্যান এবং ড্রেসারদের কোন ভূমিকা নেই। নাটকের কুশীলব একেবারে সাধারণ কৃষিজীবী দরিদ্র মানুষ। সাধারণ প্রসাধন সামগ্রী এবং সাদামাঠা পোশাকে তারা নিজেরাই নিজেদের সজ্জিত করে। অনেক লোকনাট্যে মুখোশ ব্যবহারের রীতি আছে। লোকনাট্যে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে লোকবাদ্যযন্ত্রের যেমন- বাঁশি, করতাল, দোতরা, সারিন্দা, ঢোল ব্যানা ইত্যাদির ব্যবহার ঘটে। তবে বর্তমানে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও দেখা যায়।

প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি লোকনাট্যের প্রকাশ ছিল সঙ্গীত রূপে। ক্রমবিবর্তনে তা লোকনাট্যে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই লোকনাট্যে নৃত্য-গীত-অভিনয়ের মধ্যে সঙ্গীতের প্রাধান্য রয়েই গেছে। সঙ্গীতধর্মীতা লোকনাট্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। হাস্যরসের প্রাধান্যও লোকনাট্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই হাস্যরসের কারণ শিষ্ট-রুচিতে অশ্লীল মনে হতে পারে। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের নিরিখে বিচার করলে অকৃত্রিম অথচ

স্বতঃস্ফূর্ত এই প্রয়োগকলাকে মনে হবে জীবনরসে ভরপুর এক সমাজদর্পণ।

প্রতিটি লোকনাট্য শুরু হয়ে আসর বন্দনা দিয়ে। পরিশীলিত নাটকে এমন কোন নিয়ম নেই। এতে দেবদেবী ও গুরুবন্দনা করা হয়। এই অংশে দর্শকের কাছে ত্রুটির ক্ষমা প্রার্থনা এবং নাটক যাতে ভালো হয় সেজন্য আশীর্বাদ কামনা করা হয়। কুশীলব ও দর্শকের যোগসূত্র তৈরির প্রথম ধাপ হল আসর বন্দনা। লোকনাট্যে দর্শকের সঙ্গে নাটকের চরিত্রগুলির কথোপকথন চলে। আগে থেকে দর্শকের মধ্যে বসে থাকা কোনও শিল্পী হয়ত উঠে এসে মূল অভিনয়ে প্রবেশ করে। দর্শকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের কারণে লোকনাট্য স্বতঃস্ফূর্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লোকনাট্য হল-গম্ভীরা, বোলান, আলকাপ, লেটো, ডোমনী, কুশান, দোতরা, ষষ্ঠীমঙ্গল, বিষহরা, চোর-চুরণী, খন, পাঁচালি, হালুয়া-হালুয়ানী, বনবিবির পালা ইত্যাদি। এছাড়াও লোকনাট্য হিসেবে মাস্তানি, টুসু, বঙ্কুর পালা, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদির নাম বলা যায়। 'বনবিবি পালা' সুন্দরবন অঞ্চলের লোকনাট্য। সুন্দরবনে যারা কাঠ বা মধু সংগ্রহ করতে জঙ্গলে যায় কিংবা মাছ বা কাঁকড়া ধরতে যায় তারা বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বনবিবির পুজো এবং এই পালার আয়োজন করে। হিন্দু মুসলমান উভয়েরই এই লোকনাট্যে অংশগ্রহণ করে থাকে। গতানুগতিক এই পালায় বিনোদনের চেয়ে ভক্তিভাব বড় হয়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গ, অসম এবং বাংলাদেশের রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশিষ্ট লোকনাট্য হল 'কুশান'। রামায়ণ কাহিনীই এই লোকনাট্যের মূল উপজীব্য বিষয়। 'চোর-চুরণী'ও উত্তরবঙ্গের একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য। চৌর্যবৃত্তির প্রেক্ষাপটে চোরদম্পতির দাম্পত্যজীবনের নানাদিক এবং সমকালের প্রতিচ্ছবি লঘু হাস্যরসের মাধ্যমে আলোকিত করা হয়। 'হালুয়া-হালুয়ানী' লোকনাট্য প্রকৃতপক্ষে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও পশ্চিমমেদিনীপুর জেলার কৃষক কৃষাণীর জীবন-দর্পণ। জলপাইগুড়ি জেলায় 'পালাটিয়া' নামে যে লোকনাট্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তা পাঁচালী ছাড়া কিছু নয়।

নাট্যগুণ লক্ষ্যে করে পুতুলনাচকে লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করার যুক্তি অমূলক নয়। যাত্রা কিন্তু লোকনাট্য নয়। লোকনাট্যের কিছু বৈশিষ্ট্য যাত্রার মধ্যে থাকলেও যাত্রার পরিশীলিত রূপ আদর্শ লোকনাট্যের স্বধর্ম থেকে অনেকটাই ভিন্ন। লোকনাট্য বিষয়ে সাধারণ ধারণা নেওয়ার জন্য প্রতিনিধিস্থানীয় দু' একটি লোকনাট্যের আলোচনা করা যেতে পারে।

গম্ভীরা

এ-পার বাংলা এবং ও-পার বাংলায় প্রচলিত লোকনাট্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল গম্ভীরা। গম্ভীরার উৎপত্তিস্থল মালদহ। মালদহ ছাড়াও পশ্চিম দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদে গম্ভীরার চল আছে। বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, নাচোল, ভোলাহাট প্রভৃতি অঞ্চলেও গম্ভীরা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তিতে যে চড়কপূজা বা সূর্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ঠিক তার তিন দিন আগে থাকতে গম্ভীরা উৎসব শুরু হয়। তবে চৈত্র-সংক্রান্তি ছাড়াও বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ভাদ্র মাসেও কোথাও কোথাও গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই শিবের গাজন অর্থাৎ গম্ভীরা উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত

লোকনাট্যও ধীরে ধীরে গম্ভীরা নামে পরিচিত হয়ে গেছে।

'গম্ভীরা' শব্দের অর্থ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। হরিদাস পালিতের মতে " 'গম্ভীর' শোভিত গম্ভীর মধ্যে 'গম্ভীর' দেবের পূজাস্থল বলিয়া এই মহোৎসবের নাম গম্ভীরা-উৎসব এবং এই উৎসব-স্থলের নাম গম্ভীরা হওয়াই সম্ভব।"[১]

হরিদাস পালিতের মন্তব্যটি থেকে গম্ভীরা শব্দটির তিনটি অর্থ স্পষ্ট হয়- (ক) শিবমন্দির বা যেখানে শিবের পূজো হয় তাকে গম্ভীরা বলে। (খ) এই দেবালয়কে যা-কিছু দিয়ে শোভিত করা হয় তা গম্ভীরা নামে পরিচিত। (গ) শিবের আর এক নাম গম্ভীরা।

এই পূজোয় গামার কাঠের পিঁড়ি বা দোলা ব্যবহৃত হয়। প্রদ্যোত ঘোষের বক্তব্য অনুযায়ী, গামার গাছের নাম অনুসারে গম্ভীরা নামের উৎপত্তি।[২] প্রসঙ্গত, রাতগাজনের আগের দিন গামীরগাছ কাটা'র আচার লক্ষনীয়। গম্ভীরা থেকেই গামীর শব্দটি এসেছে। তাই প্রদ্যোত ঘোষের মন্তব্যটিও অস্বীকার করা যায় না। সামগ্রিকভাবে গম্ভীরা উৎসব, এর আচার-অনুষ্ঠান, তারসঙ্গে কাহিনী, নৃত্য, গীত অভিনয় যুক্ত হয়ে কালক্রমে গম্ভীরা লোকনাট্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

সাধারণত, গ্রামের গম্ভীরা ঘরের সামনে উন্মুক্ত স্থানে চাঁদোয়া কিংবা পলিথিন বা ত্রিপলের আচ্ছাদন টাঙিয়ে মণ্ডপ তৈরি হয়, মণ্ডপের একটু দূরে থাকে সাজঘর। মণ্ডপে গোলাকার হয়ে মাটিতে দর্শক বসে। দর্শকের মাঝের গোলাকার অংশে বাদ্যযন্ত্রীরা বসেন এবং সেখানেই অভিনয় সংঘটিত হয়। বাদ্যযন্ত্রীরাই বেশিরভাগ সময় দোহারের ভূমিকা পালন করে থাকেন। পূর্বে গম্ভীরায় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে শুধুমাত্র ঢোল আর কাঁসি ব্যবহার করা হত। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, বাঁশি মন্দিরা ইত্যাদি।

গম্ভীরা পালাগানে কয়েকটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। ১. মুখপাদ ২. বন্দনা ৩. ডুয়েট বা দ্বৈতগান বা চারইয়ারী ৪. পালাবন্দী গান ৫. খবর বা রিপোর্ট।

১. মুখপাদ ঃ মুখপাদ আসলে চরিত্রগুলি পরিচয়পর্ব। গম্ভীরা পালার শুরুতেই একটি চরিত্র আসরে এসে গান গেয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। মুখপাদ-এর দুটি অংশ- 'ধুয়া' এবং 'চিতানি'।

২. বন্দনা ঃ এই অংশে আসরে শিবের আগমন ঘটে। হাতে ত্রিশূল, গায়ে বাঘছাল, মাথায় জটা। এই শিবই হলেন সরকার। শিবের সঙ্গে সাধারণ দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি রূপেও কয়েকটি চরিত্র আসরে উপস্থিত হয়। দারিদ্র্য-পীড়িত বোঝানোর জন্য তারা গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, পরনে ধুতি, মাথায় আর হাতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বা দড়ি বেঁধে রাখে। শিববন্দনা করে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা, দেশ ও দশের সমস্যার কথা শিবের সামনে তুলে ধরে। শুরু হয় উভয়পক্ষের উক্তি-প্রত্যুক্তি। কিছুক্ষণ কথা বলার পর সমস্যাগুলির প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে শিব অন্তর্হিত হন। মুসলিমরা গম্ভীরায় অংশগ্রহণের পর থেকে এই শিবই কখনও কখনও 'নানা' হয়ে যায়।

৩. ডুয়েট বা দ্বৈতগান বা চারইয়ারী ঃ এই পর্যায়ে একজন নারী ও একজন পুরুষ সংলাপ এবং সঙ্গীত পরিবেশন করে। এই পর্যায়েই চারইয়ারের অর্থাৎ চারবন্ধুর উপস্থাপনায় রঙ্গতামাশা পরিবেশিত হয় যা 'চারাইয়ারী' নামে পরিচিত। দ্বৈতগান বা চারইয়ারী অংশে সঙ্গীতের চেয়ে কাহিনী, চরিত্রগুলির সংলাপ, এবং অভিনয় বেশি

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

৪. পালাবন্দী গান ঃ একসময়ে আঞ্চলিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলিই কাহিনীর স্থান পেত। গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি কিংবা নেতিবাচক কাজের সমালোচনা, ব্যক্তিগত কেচ্ছা গম্ভীরার বিষয় হয়ে উঠত। প্রকাশ্যে যে কাজের সমালোচনা করা অসম্ভব গম্ভীরার আশ্রয়ে রঙ্গব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে তা উপস্থাপন করা এই ছিল গম্ভীরার উদ্দেশ্য। পরবর্তী ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ গণ্ডী ছেড়ে গম্ভীরা হয়ে উঠল বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক ও প্রশাসনিক বিষয়বস্তুর সচেতন প্রকাশ ও সমালোচনা-ক্ষেত্র। ডুয়েট যেমন দুজন, চারাইয়ারীতে চারজন পাত্র-পাত্রী থাকে, তেমনই পালাবন্দী গম্ভীরায় চারের বেশিও চরিত্র থাকতে পারে। এখানে একজন জনগণের প্রতিনিধি রূপে উচিত বক্তা থাকেন। তিনি দল-মত-ধর্ম-নিরপেক্ষ জনগণের সমস্যার কথা উত্থাপন করেন। সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানের মধ্য দিয়ে গম্ভীরার পালাবন্দী গান শেষ হয়।

৫. খবর বা রিপোর্ট ঃ এটি গম্ভীরার শেষ পর্যায়। দুটি চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে বিগত একবছরের আঞ্চলিক খবরাখবর প্রকাশিত হয়। বলা যায় এটি একজাতীয় বাৎসরিক পর্যালোচনা। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য অনুযায়ী- "অনুষ্ঠানটি প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের গ্রাম্য জীবনে সারাবছরের আঞ্চলিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর একটি পর্যালোচনা।"[৩]

অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় বলে গম্ভীরা একটি আনুষ্ঠানিক লোকনাট্য। নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশীয়দের মধ্যে গম্ভীরার ব্যাপক প্রচলন থাকলেও পৌণ্ড্রক-ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি—প্রাচীনকালে তো বটেই, আজও গম্ভীরা উৎসব পূজা, গীত-নৃত্যাদিতে পৌণ্ড্রক বা পৌণ্ড্রকক্ষত্রিয়গণের উৎসাহাধিক্য পরিলক্ষিত হয়।"[৪] বর্তমানে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেও এতে নিম্নবর্ণের প্রাধান্য বেশি। গম্ভীরা ধর্মীয় উৎসব হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে যখন লোকসঙ্গীত কিংবা লোকনাট্যের উদ্ভব হল তখন তা ধর্মনিরপেক্ষ রূপেই হয়ে উঠল শিল্পগুণান্বিত। গম্ভীরায় বিভিন্ন সুরের সংমিশ্রণ ঘটেছে—"বিভিন্ন সুরের সংমিশ্রণে গম্ভীরা গানের সুর সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে আলকাপ, রামপ্রসাদী, বাউল, কীর্তনের ঢঙও আছে। এর সুর সৃষ্টিতে (আজকের প্রামাণ্য সুর— standard melody) অমৃতি গ্রামের লোহারাম খলিফার অবদান সর্বাধিক। তবে ধর্মীয় বিষয়বস্তু থেকে 'সেকুলের' বা ধর্মনিরপেক্ষ জগতে এ গানকে আনার ব্যাপারে দুই মুসলিম গম্ভীরা গান লেখক মোহাম্মদ সুফী ও সেখ সোলেমানের কৃতিত্ব সর্বাধিক। মালদার লোকায়ত ভাষায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুতে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে হাস্যরসের মোড়কে এ গান এক অনন্য লোকশিক্ষার মাধ্যম সন্দেহ নেই।"[৫]

বোলান

মূলত শিবের গাজন-গান-রূপে বোলানগানের পরিচিতি থাকলেও কালক্রমে এটি নৃত্য-কাহিনী-চরিত্র সংলাপ-অভিনয়-সমন্বিত হয়ে লোকনাট্যের মর্যাদা লাভ করেছে। নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ-এই চারটি জেলার বোলানের উপস্থিতি লক্ষ্য

করা যায়। তবে নদিয়ায় বোলানের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি।

'বোলান' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল 'সাড়া বা জবাব' (চলন্তিকা-রাজশেখর বসু)। বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে বলা হয়েছে 'ডাকিলে বোলান না দেও'। মুকুন্দ চক্রবর্তীর অভয়ামঙ্গলে বোলান অর্থে-'ঘরে গেল্যা না দিয়ে বোলান'। মুর্শিদাবাদ জেলার বোলান বলতে বোঝানো হয়-কথা, বুলি বা বাক্য। নদীয়া জেলার তেহট্ট, পলাশীপাড়া অঞ্চলে বোলানের রূপভেদ হল 'বোল কাটাকাটি'। মানিকরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে 'বুলান ঘোষ' নামে যে ব্যক্তির প্রসঙ্গ আছে তিনিই বোলানের জনক বলে কেউ কেউ মনে করেন। 'বালা' শব্দ থেকে বোলান শব্দটির উদ্ভব এমনও বিশ্বাস করেন অনেকে। প্রসঙ্গত, নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ অঞ্চলে গাজনের সন্ন্যাসীদের 'বালা' বলা হয়।

তবে বোলান সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য মন্তব্য করেছেন সুকুমার সেন—ধর্মঠাকুরের ও শিবের গাজন উৎসবে মূল সন্ন্যাসী গাঁয়ের পথে পথে ঘুরিয়া যে তর্জা-ছড়া বলিত তাহার বিশিষ্ট নাম বোলান।"[৬] তিনি আরও বলেছেন বলা অর্থে 'বুলা' ধাতু থেকে বোলান শব্দটি এসেছে।

গাজন বা চড়ক হল কৃষিদেবতা শিবের উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বোলান গান গাওয়া হয়। এই গান থেকেই বোলান লোকনাট্যের উদ্ভব। তাই বোলান হল আনুষ্ঠানিক লোকনাট্য। বোলান উপলক্ষাশ্রিত, সময়কেন্দ্রিক, সাময়িক অনুষ্ঠান। পূর্বে চৈত্রমাসের শেষ তিন দিন বোলান অনুষ্ঠিত হত। চৈত্রমাসের প্রথম থেকেই বোলানের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে গাজন শেষ হয়ে যাবার পরেও বৈশাখ এমনকি জ্যৈষ্ঠমাসেও বোলান পরিবেশিত হয়। এখন অবশ্য বছরের অন্যান্য সময়েও বিভিন্ন উপলক্ষে বোলান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

নৃত্য, গীত, কাহিনী ও অভিনয়ের প্রাধান্য অনুযায়ী বোলান কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত। ক. ডাক বোলান খ. পোড়ো বোলান বা শ্মশান বোলান গ. সাঁওতেলে বোলান ঘ. পালাবন্দী বোলান। ডাক বোলানে যেমন সঙ্গীতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় তেমনই পোড়ো বোলান বা শ্মশান বোলান এবং সাঁওতেলে বোলানে থাকে নৃত্যের প্রাধান্য। আর পালাবন্দী বোলানের নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কাহিনী-প্রাধান্যের ইঙ্গিত। অর্থাৎ তা হবে অভিনয়-প্রধান। নাটকীয়তার লোকনাট্য হিসাবে পালাবন্দী বোলান অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ক. ডাক বোলান ঃ ডাক বোলান মূলত সম্মিলিত উচ্চকণ্ঠের কাহিনীমূলক গান। সেই সঙ্গে নৃত্যও পরিবেশিত হয়। ডাক বোলানের আর এক নাম দাঁড়া বোলান। "এই বোলান সকল প্রকার বীভৎসতা মুক্ত। বিপরীতক্রমে নান্দনিকতামণ্ডিত। কারণ দাঁড়া বোলানে একই সঙ্গে-নৃত্য ও গীত। গীতিনৃত্য বললেও একে অত্যুক্তি হয় না। এতে থাকে একজন মূল গায়েন আর তার সাহায্যকারী দোহারী। দলের সদস্যরা লাঠি হাতে দু'দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের বিপরীত মুখে দণ্ডায়মান হয়ে আসরে ঘুরে ঘুরে নৃত্য পরিবেশন করে। দুটি দল একসঙ্গে গায় না। একদল যখন গানে ব্যস্ত, অন্য দল তখন অঙ্গভঙ্গীসহ নৃত্যরত হয়।" [৭] পনেরো থেকে কুড়ি জন বা তার বেশি লোক নিয়ে তৈরি হয় ডাক বোলানের দল। ডাক বোলান কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। এগুলি হল-বন্দনা, পালা, পাঁচালী বা রঙপাঁচালি ও পয়ার। প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ 'বন্দনা' অংশে মন্দিরের দিকে মুখ করে শিব এবং বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করা হয়। পালা বলতে গানের

সাহায্যে কোনও কাহিনী বা ঘটনার উপস্থাপন। পৌরাণিক কাহিনীকে উপজীব্য করে পাঁচালির সুরে ডাক বোলান পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে সামাজিক বিষয়, জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক ঘটনাও কাহিনীতে স্থান পায়। পালা অংশে যে গান গাওয়া হয়, পাঁচালীতে চলে তার ব্যাখ্যা। এর মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষাও হয়। রঙপাঁচালি অংশ লঘু ও আদিরসাত্মক হওয়ায় তা ডাক বোলানকে আকর্ষণীয় করে তোলে। ডাক বোলানে প্রত্যক্ষত অভিনয়ের সুযোগ নেই। এই গানের কথায় যে নাটকীয়তা থাকে এবং অঙ্গভঙ্গি সহকারে যেভাবে নৃত্য প্রদর্শিত হয় তাতে করে গান থেকে বোলান যে ক্রমে লোকনাট্যে রূপান্তরিত হয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। পয়ার অংশে কবি, দলপতি ও মুখুরির পরিচিতি দেওয়া হয়।

ডাক বোলান দল ভ্রাম্যমান। ফলে একই গ্রামে একাধিক দলের আগমন ঘটতে পারে। রাত্রিবেলা গ্রামের গাজনতলা বা শিবতলায় হ্যাজাক বাতির আলোয় ডাক বোলান পরিবেশিত হয়। ডাক বোলানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলি হল-হারমোনিয়াম, ঢোল, ক্ল্যারিওনেট, আড়বাঁশি ইত্যাদি। গায়কদের পোষাক সাধারণ। অবশ্য মূল গায়ক, কবিয়ালের মতো চাদর বা উড়ুনি ব্যবহার করে থাকেন। ডাক বোলানের শেষে যে রঙপাঁচালী গীত হয়, সেখানে রমণীবেশী পুরুষের সাজ স্বতন্ত্র হয়।

খ. পোড়ো বোলান বা শ্মশান বোলান ঃ বোলানের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ রূপটি হল পোড়ো বোলান বা শ্মশান বোলান। এই বোলান গানের সঙ্গে নাচের ছন্দময়তায় ফুটে ওঠে একইসঙ্গে ভয়াল ও করুণ সুর। শকুনি বা গৃধিনী বা পিশাচের মতো নাচ এই বোলানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 'পোড়ো' শব্দটির প্রয়োগ কী অর্থে তা সুস্পষ্ট নয়। তবে পোড়ো বোলানের অনুষ্ঠানে মৃতদেহ, কখনও বা চিতা থেকে আনা মৃতদেহ নিয়ে নানা ধরনের তান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সেক্ষেত্রে 'পোড়া' শব্দ থেকে 'পোড়া' শব্দটি এসে থাকতে পারে। 'পোড়া' শব্দটির সঙ্গে 'পড়ুয়া' শব্দটির সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায়। পড়ুয়ার মতো বোলানও বসে বসে গাওয়া হয়।

মড়া জাগানো, কৃত্রিম শ্মশান তৈরি, শবরীমন্ত্রের প্রয়োগ, গৃধিনীবিশাল নৃত্য ইত্যাদি নানারূপে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। লোকালয় থেকে দূরে একটা স্থানকে শ্মশান কল্পনা করে নেওয়া হয়। বোলানের দিন শ্মশান-ভক্তরা হবিষ্যি করে মুখ কালি বা লাল রঙ কিংবা সিঁদুর লেপে বিভিন্ন পোষাকে কালী, শ্মশান কালী, ডাকিনী-যোগিনী, শকুনি, শেয়াল, কুকুর ইত্যাদি সাজে সজ্জিত হয়। এরপর সদ্যমৃত শিশুদেহে কিংবা নরমুণ্ডে সিঁদুর লেপন করে তার চারিদিকে বৃত্তাকারে বা অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে বলতে থাকে—"তা, তে টাক ধিন / ধিন ধেটে ধেটে ধা ....". এরই পাশাপাশি শকুনি ওড়ার মতো দু বাহু আন্দোলন করতে করতে চারদিকে ঘুরতে থাকে। এই ভয়ঙ্কর নাচকে শ্মশান জাগানো নাচ বলে। কখনও কখনও গৃধিনী নৃত্যের মাধ্যমে মৃতদেহকে ছিঁড়ে খাবার অভিনয় করা হয়।

নদীয়ার কোনও কোনও অঞ্চল ছাড়াও কাটোয়া, মর্শিদাবাদের কান্দি অঞ্চলে পোড়ো বোলানের অনুষ্ঠান চোখে পড়ে। পোড়ো বোলান হল বোলানের আদিরূপ। ঢাক ঢোল সহযোগে কৃত্য পোড়ো বোলানে বীভৎস রসের উদ্ভব ঘটলেও এবং চরিত্রগুলির সাজসজ্জার রূপায়ণ ঘটলেও লোকনাট্যের প্রত্যক্ষ লক্ষণ সেই অর্থে বেশি নেই।

গ. সাঁওতেলে বোলান ঃ সাঁওতাল জনজাতির মধ্যে প্রচলিত বোলানই হল সাঁওতেলে

বোলান। মূলত এটি যৌথ নৃত্য। এই নৃত্যে কুড়ি থেকে একশো জন পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে থাকে। এদের মাথায় ফেট্টি বাঁধা থাকে আর তাতে গোঁজা থাকে নানারকম পালক। কোমরে থাকে চামড়ার বন্ধনী। সেই বন্ধনীতে বাঁধা থাকে ক্ষুদ্রাকৃতি ঘন্টা। হাতে থাকে তীর, ধনুক, লাঠি, সড়কি ইত্যাদি। ধামসা, মাদোল, কাঁসি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। বীরসাত্মক এই নাচের সঙ্গে অত্যন্ত চড়া সুরের বাজনা বাজে।

ঘ. পালাবন্দী বোলান ঃ লোকনাট্যের প্রায় সব গুণগুলিই পালাবন্দী বোলানে লক্ষ্য করা যায়। একদিক থেকে ডাক বোলানোর সঙ্গে পালাবন্দী বোলানের মিল আছে। উভয়েরই মূল তিনটি অংশ-বন্দনা, কাহিনী এবং পাঁচালী বা রঙপাঁচালী। তবে ডাক বোলান সবই গানের আকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পালাবন্দী বোলান, কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ এবং অভিনয় এই নাট্যপ্রকরণ দ্বারা সমৃদ্ধ। পৌরাণিক বিষয় নিয়ে বহু পালা রচিত হয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে কয়েকটি পালাবন্দী বোলানের নিদর্শন মুদ্রিত হয়েছে। যেমন ঃ 'সীতার বনবাস', 'লবকুশ, 'রাজা হরিশচন্দ্র, 'দাতা কর্ণ' 'সাবিত্রী সত্যবান' ইত্যাদি। পালাবন্দী বোলানের এই সব পৌরাণিক চরিত্রগুলি লোকনাট্যের অন্দরে এসে ক্রমশ তারা লৌকিক হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র পৌরাণিক নয়, বর্তমানে সামাজিক বিষয় নিয়েও যেমন, 'এক টুকরো রুটি' 'গরীব কেন কাঁদে' ইত্যাদি পালা পালাবন্দী বোলানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বর্তমানে পালাবন্দী বোলান যাত্রার প্রভাবমুক্ত হতে পারে নি।

পালাবন্দী বোলান শুরু হয় সরস্বতী, গণেশ, শিব এবং অন্যান্য পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতাদের বন্দনা দিয়ে। বন্দনার শেষে দলের সদস্যদের পরিচয় জানানো হয়। তারপর গানে, পদ্য-সংলাপে, অভিনয় সহযোগে কাহিনী পরিবেশিত হতে থাকে। কাহিনী এগিয়ে যাওয়ার মাঝে কমিক রিলিফের মতো কোনও গান বা নারী-বেশী পুরুষের নৃত্য দর্শকের একঘেঁয়েমীকে দূর করে। কাহিনী শেষে শুরু হয় রঙপাঁচালী। আপাত-অশ্লীল হাস্যরসের মাধ্যমে যুগসচেতন হয় লোকসমাজ।

বোলান তাৎক্ষনিক বা মৌলিক রচনা নয়। এটা আগে থেকেই লিখিত রূপে থাকে। যিনি লেখেন তিনি কবেল বা ছড়াদার কিংবা বইদার নামে পরিচিত। গান, সংলাপ ইত্যাদি ধরিয়ে দেন যিনি তাকে বলে প্রম্পটার। সুরকারকে বলা হয় মাস্টার। পরিচালককে ম্যানেজার বলা হয়। নারী-বেশী পুরুষকে বলা হয় ছুকরি। বোলানের নিজস্ব কোনও সুর নেই। সুরকার বিভিন্ন লৌকিক সুর যেমন নেন আবার জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের সুরকেও প্রয়োজনে গ্রহণ করে থাকেন।

আলকাপ

আলকাপের উদ্ভব সম্পর্কে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেছেন—"অভিজ্ঞতায় জেনেছিলাম, আলকাপের উৎস অন্যত্র। এই নাট্যরীতি গ্রাম-সমাজের বহুকাল ধরে যৌথ সৃষ্টি। উৎসমুখ যদি কোথাও থাকে, তা চৈত্র সংক্রান্তির গাজন অনুষ্ঠানে- যার দেবতা শিব। আদি আলকাপে শিবের ছড়া গাওয়া অনিবার্য অনুষ্ঠান ছিল।

আদি আলকাপেরই একটি শাখা গম্ভীরা। এখনও এই দেবতা তার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু আলকাপের মূল স্রোত কালক্রমে দেবতাটিকে পেছনে রেখে এগিয়ে যায়।"[৮] বীরভূম

এবং তৎ-সংলগ্ন মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলে আলকাপ যে 'ছ্যাঁচড়' নামেও পরিচিত ছিল সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মন্তব্য থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে আলকাপ গম্ভীরার মতো অনুষ্ঠান-নির্ভর নয় অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিক। 'ছ্যাঁচড়া' শব্দটির ব্যাখ্যায় তিনি 'চোর-ছ্যাঁচড়' অর্থাৎ নিন্দাসূচক শব্দ এবং 'ছ্যাঁচড়া' অর্থাৎ তরকারির ঘন্টের প্রসঙ্গ টেনেছেন।

স্বাভাবিকভাবে আলকাপ লোকনাট্যটি তথ্যকথিত অর্থে পরিশীলিত নয় এবং পাঁচমেশালী অনুষ্ঠান নিয়ে আলকাপ 'ছ্যাঁচড়া'র মতোই সুস্বাদু সন্দেহ নেই।

একথা ঠিক যে মুর্শিদাবাদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং সমৃদ্ধ লোকনাট্যের নাম আলকাপ। কিন্তু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মন্তব্য থেকে একথাও বলা যায় যে, আলকাপ শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদেরই লোকনাট্য তা নয়, বীরভূম, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া, বাঁকুড়া বর্ধমানেও আলকাপ প্রচলিত।

এছাড়াও বিহারের সাহেবগঞ্জ, পূর্ণিয়া, দুমকা এবং বাংলাদেশের শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ এবং রাজশাহী জেলার অনেক জায়গায় আলকাপ একটি প্রচলিত লোকনাট্য।

আলকাপ নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই লোকনাট্যের বিশেষত্ব। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—আলকাপ হল সম্ভবত আরবি শব্দ যার অর্থ সামাজিক ব্যঙ্গ। ক্ষীরী পালের মতে আলকাপ দুটি পার্শী শব্দের সমাহার। আল্ মানে আধুনিক এবং কাপের অর্থ মস্করা। অর্থাৎ আধুনিক মস্করা। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মতে "আল" প্রাচীন বাংলা শব্দ। অর্থ ঃ রঙ্গরস। 'কাপ'-ও তাই। অর্থ ঃ কৌতুকনাটিকা। 'আলকাপ' অর্থঃ রঙ্গরসাত্মক নাটিকা। .... তবে আক্ষরিক অর্থে আলকাপ রঙ্গরসাত্মক নাটিকা হলেও শব্দটির সামাজিক অর্থ (সোশ্যাল মিনিং) হল, রঙ্গব্যঙ্গাত্মক নাটিকা। .... ঝাঁকসাজী অবশ্য আসরে দাঁড়িয়ে অন্য ব্যাখ্যা প্রচার করতেন। বলতেন, আল মানে মৌমাছির বিষাক্ত হুল। যে-কাপে হাসির সঙ্গে হুলের বিষ মেশানো, তাই আলকাপ।"[৯] তাই আলকাপ হল ব্যঙ্গবিদ্রুপধর্মী লোকনাট্য।

আলকাপ অনানুষ্ঠানিক বলে বর্ষাকাল ছাড়া সবসময় অনুষ্ঠিত হতে পারে। দলে সাধারণত জনা দশেক শিল্পী থাকেন। দলের যিনি ওস্তাদ অর্থাৎ পালা বাঁধেন কিংবা ছড়া রচনা করেন তাঁকে মাস্টার, ছড়াদার কিংবা খলিফা বলা হয়। আলকাপের মূল যে চরিত্র অর্থাৎ কমেডিয়ান তিনি কপ্যা, কপে, সঙদার, সঙাল নামে পরিচিত। আলকাপে পুরুষেরাই নারীর চরিত্রে অভিনয় করেন। এদেরকে ছোকরা বলা হয়। এদের মুখশ্রী সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। নৃত্যগীতে পটু হতে হয় এদের। এদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে বয়সের দিকটি মাথায় রাখা হয়-"নামুতে বারো ওপরে বিশ তাতে একটু উনিশবিশ।" খেমটা নাচে বলে ছোকরাদের খেমটিও বলা হয়ে থাকে। দলে এই রকম দু'জন নাচিয়ে ছোকরা থাকে। আর থাকে যন্ত্রশিল্পীরা-হারমোনিয়ামবাদক, তবলাবাদক। চার জনের মতো দোহারকি থাকে। এখানের সকলকেই প্রয়োজনে অভিনেতা হতে হয়।

চারপাশে দর্শক এবং মধ্যিখানে আসর—এভাবেই লোকালয় থেকে একটু দূরে ফাঁকা মাঠে আলকাপ অনুষ্ঠিত হয়। বর্গাকৃতি বা বৃত্তাকার দশ-বারো ফুট জায়গার উপর অভিনয়স্থান নির্দিষ্ট হয়। "প্রবেশ-প্রস্থান পথ থাকে না যাত্রার মতো। সচরাচর দুটি দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার রীতি আছে। তাকে বলে পাল্লার আসর। আসর ঘেঁষে দুই মেরুতে

দুটি দল বসে। মধ্যিখানে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা। একদলের অনুষ্ঠান চলে মোটামুটি ঘণ্টা তিনেক। তারপর অন্যদল অনুষ্ঠান শুরু করে। এভাবে পালাক্রমে চলতে চলতে রাত পোহায়। দিনেও চলতে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হলে (তীব্র করার জন্য মেডেল ও কাপও অনেক সময় টাঙানো হয়।) ছত্রিশঘণ্টা আসর চলাও বিচিত্র নয়। অনুষ্ঠান বিরতির সুযোগে একদল নেয়ে-খেয়ে এসে আসরে ফের বসে।"[১০]

আলকাপের সৃষ্টি প্রথম কার হাত ধরে হয়েছিল সেই বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও লোকনাট্য হিসেবে আলকাপের জনপ্রিয়তা বিস্তারে ওস্তাদ বোনাকানা এবং ঝাঁকসুর (ধনঞ্জয় সরকার) অবদান সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। বোনাকানার সময় আলকাপ ছিল একটিমাত্র আঙ্গিক-'কাপ' বা 'নক্সা'। ওস্তাদ ঝাঁকসু এই আলকাপকে আসর বন্দনা বৈঠকী গান, ছড়াগান, কাপ ও পালাগান-এই পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করে পঞ্চরসে পরিবর্তিত করলেন।

প্রথমে শিল্পীরা আসরে এসে বসেন। তারপর যন্ত্রসঙ্গীত বাজানোর মধ্য দিয়ে আলকাপের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর দেবদেবী, দলের দীক্ষাগুরু, দলের পরবর্তী ওস্তাদ এবং বর্তমান ওস্তাদের নামে শিল্পীরা জয়ধ্বনি দেন। জয়ধ্বনি শেষ হলে কিছুক্ষণের জন্য পুনরায় যন্ত্রসঙ্গীত বেজে ওঠে। এরপর শুরু হয় আসর বন্দনা। 'খলিফা' বা ছোকরা দেবদেবীর বন্দনা গানের মাধ্যমে আশীর্বাদ কামনা করেন। বাকীরা ধুয়া দেন। বন্দনা পর্ব শেষ হলে শুরু হয় বৈঠকী গান। এই পর্যায়ে বিভিন্ন লোকসঙ্গীত, সিনেমার চটুল হিন্দী বা বাংলা গান গাওয়া হয়। কখনও কখনও মৌলিক কথা ও সুরে দলের ছোকরা নৃত্যসহ গান করে। ভোলার বন্দনা অংশে শিবকে বন্দনা করার পাশাপাশি সমাজের সমস্যার কথা বলে শিবকে দোষী করা হয়। এরপর শুরু হয় কাপ বা সঙ। সংদার বা সঙালের সঙ্গে ছোকরাদের নানা কথোপকথনে এবং নৃত্যের মাধ্যমে রঙ্গ-রসিকতা চলতে থাকে। বৈঠকী গান শেষ হলে ওস্তাদ এসে সমকালীন দেশের পরিস্থিতি নিয়ে তাৎক্ষণিক ছড়া বেঁধে কবিয়ালের মতো পয়ারছন্দে ছড়া গেয়ে যান। এবার অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ 'পালা' শুরু হয়। সাধারণত, এই পালা আধঘণ্টা থেকে আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত চলে। আলকাপের কোনও লিখিত স্ক্রিপ্ট থাকে না। ফলে সংলাপ মুখস্থ করার দায়ও শিল্পীর থাকে না। কাহিনীটা তাদের জানা থাকে। কিন্তু শিল্পীরা উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে সংলাপ তৈরি করে তাৎক্ষণিক। দর্শকের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যক্ষ সংযোগে শিল্পীরা লোকনাট্যকে নৃত্য-গীত, অভিনয় দিয়ে রঙ্গব্যঙ্গে মাতিয়ে তোলে।

লেটো

বাঁকুড়া বর্ধমান, হুগলী, নদিয়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হাওড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত এবং জনপ্রিয় লোকনাট্য হল লেটো। এটি ভাঁড়যাত্রা নামেও পরিচিত। কোন মেলা, পরব বা উৎসবে উপলক্ষে লেটো অনুষ্ঠিত হয়। অনানুষ্ঠানিক এই লোকনাট্য সাধারণত আশ্বিনমাস থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভালোবেসেই কেউ কেউ লেটোর দল গঠন করেন। তিনিই লেটোদলের মালিক। মালিক ছাড়াও ম্যানেজার, মাস্টার, সংদার, অভিনেতা, অভিনেত্রী, দোহার বাদ্যযন্ত্রশিল্পী, মেক-আপ-ম্যান, মাইকম্যান, রাঁধুনি ও অন্যান্য কর্মী নিয়ে প্রায় কুড়ি-ত্রিশ জনের দল গঠিত হয়। অন্যান্য

লোকনাট্যের মতো লেটোতেও পুরুষেরাই নারীর ভূমিকায় অভিনয় করে। এরা সখী, বাই বা ছোকরা নামে পরিচিত। লেটোর প্রধান আকর্ষণ কৌতুকরস সৃষ্টি। নৃত্য গীত থাকলেও অভিনয়ের মাধ্যমে এই হাসারসের সৃষ্টির প্রধান চরিত্র হল কমেডিয়ান বা সংদার বা সঙ্গাল। সংদারের অঙ্গভঙ্গী, কথাবার্তা এবং অভিনয়গুণে দর্শক হাসিতে ফেটে পড়ে। লেটোয় রাজা, উজির কিংবা রাজপুত্রের চরিত্রে যারা অভিনয় করে তাদের পাঠক বলে। লেটোতে শিশু বা কিশোর শিল্পীকে বেঙাচি বলে। এদের সংলাপ বিদ্রুপাত্মক এবং আকর্ষণীয় হয়। অস্থায়ী শিল্পীদের বলা হয় আসামী। মাস্টার গান রচনা করেন এবং সুর দেন। লেটো পালার সামগ্রিক পরিচালনার দায়িত্ব মূলত তারই।

লেটো পালার প্রথম পর্যায় হল ঐক্যতান বাদন। বাদন শেষ হলে চারজন সখী 'আরতি সঙ্গীত' পরিবেশন করে। তারপর সূত্রধার প্রণাম সহকারে দর্শকের কাছ থেকে লেটো পরিবেশনের অনুমতি নিলে সংদার বন্দনাগীত শুরু করেন। সখীরূপী ছেলেরাও নাচে গানে বন্দনায় অংশগ্রহণ করে। এরের পরের পর্যায় 'সখী নৃত্য'। এটি 'ব্যাঙের নাচ' নামেও পরিচিত। একে একে নৃত্যসহ পরিবেশিত হয় 'একানে গান', 'ডুয়েট গান'। এই ডুয়েট গান বেশ আকর্ষণীয় এবং হাস্যরসাত্মক—"এই পর্বে একজন পুরুষ ও একজন নারী কখনো স্বামী-স্ত্রী কখনো প্রেমিক-প্রেমিকার ভূমিকায় সংলাপ বলেন, অভিনয় করেন। মাঝে মাঝে বাংলা-হিন্দী চলচ্চিত্রের ও অন্যান্য প্রেম বিষয়ক গান নৃত্য সহযোগে পরিবেশন করেন। এই গানের ভাব বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই হাল্কা ও চটুল ও নৃত্য শৃঙ্গার রসাত্মক হয়ে থাকে।"[১১] এর পরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্যায়টি হল 'ছক'। সংদার এবং তার সহযোগী অভিনেতারা দর্শকদের হাস্যরসে মাতিয়ে দেন। "আসলে ছক হল হাস্যরসাত্মক ক্ষুদ্র মাপের নাটক। এটি হল লেটোর প্রথমাংশ যার প্রধান আকর্ষণ হল কৌতুকরস। কয়েকটি ছক হল এরূপ তাঁতি বোষ্টম, জুতো মারা, বাবলুর মা, জলবতী কন্যা, লালুভুলু, বিদ্যে বড় না বুদ্ধি বড়, হাতিমারা, বৃন্দাবনে সবাই সতী ইত্যাদি। লেটো গানের দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে কাহিনী। এইসব কাহিনী কখনও পুরাণাশ্রিত, আবার কখনও তা ইতিহাসাশ্রিত। যেমন দাতা কর্ণ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, কংস বধ, রাজা লক্ষণ সেন, পলাশীর পরে, রত্নমালা, মাটির কেল্লা, শয়তানের চর ইত্যাদি।"[১২]

লোকনাট্য শুধুমাত্র বিনোদনের উপায় নয়, তা লোকসমাজের জীবনের প্রতিফলন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অন্যায়-অবিচার, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জীবন্ত দলিল। এর মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষা হয়। সমাজসচেতন হয় লোকমানস। লোকনাট্য লোকসাংবাদিকতার কাজও করে। লোকনাট্যের মাধ্যমে সমসাময়িক ঘটনাগুলিও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায় সহজে। লোকসমাজের একঘেয়েমি জীবনে এই লোকনাট্য সাধারণ মানুষের মনে এনে দেয় বৈচিত্রময় সুবাতাস। সময় বদলেছে, বদলাচ্ছে। এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ঘরে ঘরে কেবিল টিভি, হাতে হাতে মোবাইল ফোন। তাই সংশয় জাগে, লোকনাট্য আর কতদিন তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারবে! অনেক আগে থেকেই লোকনাট্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। বিষয়ে, আঙ্গিকে তার নমুনা প্রচুর। কিন্তু এটাই তো স্বাভাবিক। লোকনাট্য তো সময়ের দাবী মানে। কই এত আধুনিকতার ছোঁয়ায় তো গাজন উঠে যায় নি। কৃষিকাজ থেমে যায় নি। রামায়ণ তো বঙ্গজীবন থেকে এখনও লোপ পায় নি। এখনও তো সুন্দরবনের মানুষকে মধু, কাঠ সংগ্রহ করতে জঙ্গলে যেতে হয়। তাই গাজন থাকলে গম্ভীরা থাকবে। থাকবে বোলান আর আলকাপ।

থাকবে 'কুশান', 'হালুয়া-হালুয়ানী', 'বনবিবি পালা'। হয়ত লোকনাট্যের কিছু বাহ্যিক, পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু লোকনাট্য তার স্বতঃস্ফূর্ততায় বেঁচে থাকবে। কারণ তার প্রাণ লুকিয়ে আছে রূপকথার কৌটোর ভিতরে রাখা ভ্রমরের মধ্যে।

সূত্রনির্দেশ

১. পালিত হরিদাস, 'আদ্যের গম্ভীরা', ১৩১৯, পৃঃ ৬-৭।

২. ঘোষ প্রদ্যোত, 'লোকসংস্কৃতি গম্ভীরা', পুস্তক বিপণি, ১৯৮২, পৃঃ ৪।

৩. ভট্টাচার্য আশুতোষ, 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮২, পৃঃ ১৩১-১৩২।

৪. ঘোষ প্রদ্যোত, 'গ্রামীণ লোকনাটক ঃ গম্ভীরা', 'বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক', সম্পাদনা-শ্রীসনৎকুমার মিত্র, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃঃ ৬২।

৫. ঘোষ প্রদ্যোত, 'গম্ভীরা', 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ', সম্পাদনা-বরুণকুমার চক্রবর্তী, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৫, পৃঃ ১০০-১০১।

৬. সেন সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ১৯৬৫, পৃঃ ৫৯৩।

৭. চক্রবর্তী বরুণকুমার, 'বোলান ঃ একটি দ্রুত বিলীয়মান লোক আঙ্গিক, এস. এস পাবলিকেশন, ২০১৫, পৃঃ ১৬।

৮. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, 'আলকাপ নাট্যরীতি এবং থার্ড থিয়েটার', মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য, 'মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০০, পৃঃ৪৮

৯. ওই, পৃঃ ৪৯

১০. ওই, পৃঃ ৪০

১১. নাথ সঞ্জীব, 'লেটো', 'বাংলার লোকনাট্য ঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৩, পৃ. ৯২।

১২. চক্রবর্তী বরুণকুমার, 'লেটো', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০১, পৃঃ ২১।